প্রথম অধ্যায়

উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা : বিষয়বিন্যাস ও শৈলীগত বৈচিত্র

> "Pattern is the quality in a book which gives it wholeness and meaning, makes the reading of it a complete and satisfying experience."[১]

'Pattern' বা ধরন এই শব্দটির মধ্যেই আমরা পরিবর্তন, স্বতন্ত্রতা, নতুনত্ব ইত্যাদির ব্যঞ্জনাকে খুঁজতে পারি। উপন্যাস কী, কেন, তার জন্ম বিকাশ বা আজকের চলমান ধারায় কীভাবে এল তার একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তার প্রকৃতিগত রূপ কীভাবে পাল্টাচ্ছে এবং তত্ত্বগত সাহিত্য চিন্তায় সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কী রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তার আলোচনা সমীচীন হয়ে পড়েছে। কখনও বিষয়গত বিভাজনে আবার কখনও লেখকের লেখনীর নিজস্ব ধরনে তার শৈলী অর্থাৎ 'style' পাল্টে যাচ্ছে।

গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটুস্ বলেছিলেন, বহতা নদীর জলে যে কেউ একবার স্নান করতে পারে। কারণ স্থান এক হলেও সেই জল থেমে থাকে না। চলমান – তাই জলের প্রকৃতি। ঠিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বলতে পারি আধুনিক যুগে সময়ের পালাবদলের সঙ্গে তার জন্ম। কিন্তু তার বিকাশের পথে আমরা উপন্যাসের সমগ্রতাকে স্বীকার করেও বিষয়গত, শৈলীগত বৈচিত্রের মাধ্যমে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিতে চাই। সময় থেমে থাকে না, সময় বদলের সঙ্গে নতুন চিন্তাধারা, নতুন সৃষ্টি তার নিজস্ব ধরনে আমাদের সামনে তার অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়।

প্রত্যেক সৃষ্টির পেছনেই একটি ইতিহাস থাকে। ইতিহাস পরিবর্তনের কথা বলে। এই পরিবর্তন জীবন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ জনৈক ঐতিহাসিকের কথায় — 'History is the process of

change in living'। সমস্যাসংকুল মানবজীবনের সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতির প্রতিরূপ আদি যুগ বা প্রাচীন যুগে এবং মধ্যযুগেও বিভিন্ন পদ, কাব্য, গাথা ইত্যাদি রচনার মধ্যেও দেখা যায়। কবিরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যথাসম্ভব বাস্তবকে ধরারও চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের রচনায় যেখানে আজ আমরা জাতির পূর্ব ইতিহাসকে এবং সেই সমাজ বাস্তবতাকে খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু চর্যাপদ ব্যতীত মধ্যযুগীয় কাব্য গাথাগুলো ছিল সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজা-রাজড়ার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাজসভায় মনোরঞ্জনের জন্য রচিত। তাই সমাজ-বাস্তবতার চেয়েও তাদের গুণকীর্তন বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। সচেতন কবিরাও ক্ষমতা এবং প্রভুত্বের কাছে নিজের ইচ্ছাকে দমন করতে বাধ্য ছিলেন। কারণ সেই সময়ে কবিদের রাজসভায় কাব্য রচনা করতে হত এবং তাঁরা রাজার পছন্দমত কাব্য রচনা করতে বাধ্য ছিলেন। ১৮৬০ অর্থাৎ উনবিংশ শতক থেকেই যাকে আমরা আখ্যায়িত করেছি আধুনিক যুগ (Modern age) নামে; এই যুগ ছিল নবজাগরণের যুগ। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিপ্লব, বিদ্রোহ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে কেট্‌লের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে —

> "The impulse towards realism was part and parcel of the break down of the revolution the transformed the Feudal world"[২]

এই বিপ্লবাত্মক ঘূর্ণির ছোঁয়ায় আন্দোলিত হয়েছিল বৃহৎ বঙ্গও। বহিরাগত ব্রিটিশ শাসনে, শোষণে, অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ ধীরে ধীরে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বুঝতে শিখল। যেহেতু সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি, সময়ের দলিল, তাই সময় পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে জীবনসমস্যা, চেতনাবোধও পাল্টে গেল। সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা সমগ্র জাতির সত্তাকে জাগানোর জন্য, নিজের জীবনের ও জাতির জীবনের কাহিনিকেই অস্ত্র হিসেবে ধারণ করলেন। গদ্য-গল্প-আখ্যান-প্রহসন ইত্যাদি থেকে আরো একটু ভিন্নমাত্রার মাধ্যম উপন্যাস। যার আভাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে উপন্যাস রচনার কিছু কৌশল, কার্যকারণ সম্পর্ক, বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে, ইউরোপীয় মডেলের ধরনকে লক্ষ করে উপন্যাস সার্থক রূপ লাভ করল বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)-এর মধ্যে। বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম সার্থক উপন্যাস রূপে যাত্রারম্ভের মুহূর্ত। যার সূচনাকর্তা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যুগ যুগান্ত পেরিয়ে আমরা বিভিন্ন, ইউরোপীয় জাতি, সমাজ এবং সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে আধুনিক জীবন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এই আধুনিক সাহিত্যেরই একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি উপন্যাস।

সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মর্তব্য —

> ''একদা মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যন্ত্রসভ্যতা, যুক্তিবাদী দর্শন ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সেই নতুন যুগের কথাশিল্প এই উপন্যাস।"[৩]

নানা মুনির নানা মত অর্থাৎ বিভিন্ন বিদগ্ধ পণ্ডিত সমালোচকগণ উপন্যাস কাকে বলে এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। নির্দিষ্ট করেছেন উপন্যাসের বহুবিধ লক্ষণ। এই সব সংজ্ঞা ও লক্ষণের প্রায় সবকটিই এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরে। যার আদল এবং ধরনকে অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। তথ্যের উপর ভিত্তি করে দেখা যায়, বোকাচ্চিও-র 'Decameron' (1348-1353) থেকেই ইউরোপে গদ্যভাষায় বাস্তবধর্মী যথার্থ আখ্যান শুরু হয়। বোকাচ্চিও-র এই আখ্যানগ্রন্থকে 'Novella stories' বলা হয় বাংলায় যাকে বলা যায় 'নতুন গল্প'। পরবর্তী সময় থেকে 'Novella' শব্দ থেকেই Novel শব্দের সৃষ্টি। আর ইংরেজি নভেলেরই বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে 'উপন্যাস'। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়ে উপন্যাস হল 'উপ' অর্থাৎ উপকথা বা কল্পিত কাহিনি। 'ন্যাস' স্থাপন করা বা রাখা। কিন্তু কালোচিত বিচারে উপন্যাস, ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবনদর্শন ও নৈতিক মূল্যবোধেরও অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে তিনি সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টি জ্ঞান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার গূঢ় তাৎপর্যকে নিজস্ব রীতিতে স্থাপন করে থাকেন। সমালোচক 'Hudson' উপন্যাস সম্পর্কে সংজ্ঞা নির্দেশে বলেছিলেন —'Every novel must necessarily present a certain view of life and some of the problem of life।' অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপন্যাসই অত্যাবশ্যক বাস্তব জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত জীবনদৃষ্টি ও জীবনের সমস্যাগুলোর উপস্থিতি।

বাস্তব জীবনের ঘাত-সংঘাত বলা শ্রেয় সাধারণ জনজীবনের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের লড়াই, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-র প্রতিফলিত সামগ্রিক শিল্পরূপই উপন্যাস। উপন্যাসের আগেও ইউরোপীয় ও বাংলা সাহিত্যে, গল্প, কাহিনি অর্থাৎ রূপকথা (Fairy tale) ছিল। এই কল্পিত কাহিনিগুলির বাস্তবের সঙ্গে যোগ ছিল না বললেই চলে। তা ছিল বিবরণ, কী ঘটেছিল তারই ধারাভাষ্য। উপন্যাস কিন্তু বিবরণে ক্ষান্ত থাকেনি। জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছে আমাদের মনে : কেন ঘটেছিল। জিজ্ঞাসার বিস্তৃত একটা ক্ষেত্র আমাদের সামনে প্রস্তুত করে। যা শেষ হয়েও শেষ হয় না -- একটা নতুন

আরম্ভের সূচনা করে। যথার্থ উপন্যাসে থাকে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক, ফলাফলের বিশ্লেষণ, সময়ের দলিল, লেখকের আত্মোপলব্ধি এবং নিজস্ব জীবন বীক্ষার দৃষ্টিকোণ বা আত্মদর্শন।

জীবন বিচিত্র, জগৎও বিচিত্র এবং এই বিচিত্রতা উদ্ভুত হয় প্রত্যেক মানুষের মৌলিক কিছু যুক্তি সম্বলিত চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা থেকে। আধুনিক যুগের সর্বোত্তম লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হল যুক্তি ও প্রমাণ। উপন্যাস অর্থাৎ সার্থক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন বিদগ্ধ মনীষীগণ বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনা করেছেন, অভিমত ব্যক্ত করেছেন কিন্তু প্রাথমিক শর্তগুলোকে ছেড়ে নয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের স্বরূপ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —

> ‘‘প্রত্যেকটি উপন্যাস শিল্পীর অন্তরাত্মার প্রতিফলন। সুতরাং উপন্যাসের শিল্প বিচারের সময় আমাদের দেখতে হয় পাঁচটি বিষয়। এক, কোন পদ্ধতিতে শিল্পী জগৎ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; দুই, তিনি কী গভীরভাবে অনুধাবন করেন; তিন, কী তিনি পরিহার করেছেন; চার, কোন ধরনের সমস্যা তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন; পাঁচ, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোন নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন – এই পঞ্চ পরিচয়ের ওপরে ঔপন্যাসিকের ওপরে মানসোৎকর্ষের বিচার হবে। এবং এর উপর একটা উপন্যাস শিল্পকর্ম হিসাবে কতখানি উত্তীর্ণ হল তারও মীমাংসা হবে। শিল্পীর অন্তরাত্মার পরিচয় গ্রহণের কালে এই পদ্ধতির ভিতরে তাঁর সমাজ সভ্যতা বিষয়ক জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হবে।’’[৪]

উপন্যাসের গঠনশৈলী (ফর্ম), তার মৌলিকত্ব, স্বকীয়তা নিয়ে যারা ভেবেছেন তাদের মন্তব্য ধরেই আমরা একটি আপাত সংজ্ঞায়নের দিকে যেতে পারি। জীবনকে দেখার, উপলব্ধি করার দর্পণ বলা যায় উপন্যাসকে। এই জীবন ব্যক্তি-বিশেষ ও সমষ্টি-বিশেষের অন্বয়। প্রাণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এবং চেতনা মানুষকে জাগিয়ে রাখে। এই জাগরণ অন্তর্জাগরণ। অন্তর্জাগরণ থেকেই অন্তর্দৃষ্টি (inner eye) দিয়ে লেখক সমাজের বাস্তবের রূপকে যথাসম্ভব তুলে ধরেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সময়ের সমন্বিত ঘাত-প্রতিঘাতের দলিল রূপেই উপন্যাসকে চিহ্নিত করা যায়। বাস্তব জীবনের প্রেক্ষিত, উত্তাল সময়ে বিপর্যস্ত মানবজীবনের আর্তি, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসকে অনন্য ব্যঞ্জনা দান করে। সামাজিক

সংঘাত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাসও সেখানে উপস্থিত থাকে। সচেতন ঔপন্যাসিকরা কাহিনিবদ্ধ দলিলরূপে উপন্যাস নামক শিল্প সাহিত্যে তাঁদের এই অভিব্যক্তিগুলো শিল্পায়িত করে রাখেন।সমাজের আধিপত্যাধীন, জাঁতাকলে নিষ্পেষিত, প্রান্তিকায়িত, পীড়িত ও অত্যাচারিতদের নিয়ে সরব ও সহমর্মী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। তিনি নিজের লেখার বিষয়ে বলেন যে, তিনি সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী। তাঁর বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য লেখনী সময়ের ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত। '*অরণ্যের অধিকার*' আদিবাসী কৌম সমাজের সংগ্রামের তথ্যসম্বলিত আখ্যান। যা সুস্পষ্ট করে তোলে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ের বাস্তব পরিস্থিতির রূপকে। সেলিনা হোসেনের ত্রয়ী '*গায়ত্রী সন্ধ্যা*'য় দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে উত্তাল সময়ের সঙ্কট ও ভয়াবহ পরিস্থিতি। দেশভাগ, উদ্বাস্তু জনজীবনের বিচ্ছিন্নতা, অস্থির থমথমে পরিস্থিতি। বাঁচার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছে মানুষকে। প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি কাটত নানা আশঙ্কায়। নায়ক বা উপন্যাসের সূত্রধর আলি আহমদের চেতনাকে বারবার দোলা দিয়ে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে সময়ের ভয়াবহতা। ভয়াবহ অস্থির সময়ের দ্রষ্টারূপে প্রতিবেদনের মুখ্য চরিত্র রূপে পেয়েছি তাকে। আদিবাসীদের রানিমা ইলা মিত্র, তার স্বামী রমেন মিত্র কৃষকদের অধিকারের লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই চরিত্রগুলো কল্পনা বহির্ভূত, এরা তো আমাদের সমাজের বাস্তব অস্তিত্ব, সংগ্রামী নেতৃবর্গীয় ব্যক্তিত্ব। ইলা মিত্র যিনি পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। বিদ্রোহের অপরাধে নির্মমভাবে, অমানবিকভাবে তাকে অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু এই অদম্য সাহসী নারী নতি স্বীকার করেননি অন্যায় ও শোষণের কাছে। এই বাস্তব রক্ত-মাংসের নারীই তো সেলিনা হোসেনের প্রতিবেদনে চরিত্র হয়ে উঠেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'-এর বিষয় আদিবাসী কৌম সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। অরণ্য যাদের মাতা, আরাধ্য দেবী, জীবনের চলার প্রেরণার ছন্দ, এই অরণ্যে যখন ইংরেজরা হাত দিল আদিবাসীরা আর সহ্য করলেন না। বীরসা তার কৌম সমাজের রক্ষায়, অরণ্যের রক্ষায়, মৌলিক অধিকারের দাবিতে বৃহৎ সংগ্রামে ব্রতী হল। বীরসার নেতৃত্বে গড়ে উঠল বৃহৎ 'উলগুলান' অর্থাৎ সংগ্রাম। তাদের 'উলগুলান' মৌলিক অধিকারের লড়াই দিয়ে শুরু হয়ে কৌম সমাজের স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। অরণ্য বীরসার কাছে ছিল প্রাণ, ধমনী, অরণ্যের মধ্যে আশৈশব থেকে সে শুনতে পেয়েছে অন্তরের সুর-স্পন্দন। তাই এই অরণ্যের জন্য সে জীবন ত্যাগেও পিছপা হয়নি। কারণ বীরসার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সংগ্রামী চেতনা। সে জেনেছিল

তার (বীরসার) ত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে জন্ম নেবে আরও হাজার বীরসা। এই তার বিশ্বাস, তাই উলগুলানের শেষ নেই অর্থাৎ সংগ্রাম কখনও ফুরোয় না। তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে এটাও তো বাস্তবের শিল্পিত রূপ। সতীনাথ ভাদুড়ীর '৪২'-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত প্রতিবেদন 'জাগরী'। এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র বাবা, মা, নীলু ও বিলুর আত্মমন্থনে উঠে এসেছে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আবহের ঘূর্ণাবর্তের সুস্পষ্ট ছবি। এখানে যদিও কোনও ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্র নেই, তবুও বাবা, মা, নীলু ও বিলুর মাধ্যমে উঠে এসেছে উত্তাল সময় পরিস্থিতির বাস্তব অচলাবস্থা। দেশের ক্রান্তিকালে, উত্তাল সময়, পরিস্থিতির ভয়াবহ আতঙ্কে উদ্বেল সবাই। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষভাবে সবাই জড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে পারিবারিক জীবন বিনষ্ট হচ্ছে ও সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে। রাজনৈতিক মতাদর্শের মনোমালিন্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে আপনতা, তারই বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

সময়ের প্রবহমানতায় সাহিত্য সৃষ্টির পথে এসেছে বৈচিত্র। কাহিনির মোহজাল ত্যাগ করে সামাজিক, নৈতিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছেন সচেতন শিল্পীরা। তাদের চেতনা মন থেকে উদ্ভুত প্রতিবাদের ভাষা নতুন বিষয়বস্তু ও স্বতন্ত্র লেখনী প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করেছে। 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় সমালোচক তাই উপন্যাসের জন্ম লগ্ন থেকে ক্রমবিবর্তিত পথের আলোচনায় পরিণতির দোরগোড়ায় উচ্চারণ করেছেন —

> ''বাংলা উপন্যাসের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রের শাখাপথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে। আজ ইহার অন্তঃপ্রেরণা কেবল ইহার দেশের প্রত্যক্ষ সমাজবিবর্তনের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যেখানে নূতন জীবন পরীক্ষা চলিতেছে, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন নূতন জীবন ভাষ্য রচনার চেষ্টা করিতেছে; যেখানে পুরাতন অভিজ্ঞতায় সীমা অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহারই সম্মিলিত প্রভাব এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। অধুনা নূতন সৃষ্টি সম্ভাবনা অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা আজ আর কোথাও সমাপ্তি রেখা টানিবার ভরসা পাইতেছে না। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিচারের মানদণ্ড দিনে দিনে রূপ বদলাইতেছে।''[৫]

উনিশ শতক ছিল উপন্যাসের জন্মলগ্ন। একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচক। এই সময় নানা ঘাত প্রতিঘাতে, বিপ্লব ও নবজাগরণে সামাজিক পালাবদল ঘটেছে। যার ফলে সচেতন বৌদ্ধিক মহলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্ম নিয়েছে। এই সময়টা ছিল সন্ধিক্ষণের, নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের সময়। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি টান অন্যদিকে নতুনত্বকে বরণ করার পালা। তাই হাজার বছরের সংস্কারকে অতিক্রম করে বুদ্ধি, যুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্ত অগ্নিশিখায় জন্ম হল আধুনিক যুগের। যে যুগের রশ্মিতে মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব, ভাষা ও কথা মুখ্য রূপ লাভ করল সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে। বিশেষত উপন্যাস নামক শিল্প সাহিত্য মানুষের তথা সমাজের, সামাজিক, সামগ্রিক প্রতিচ্ছবিকে প্রস্ফুটিত করল। মধ্যযুগীয় ধর্মবোধ, অলৌকিকতার ভিত্তি থেকে উদ্ভুত দেবদেবী নির্ভর কাব্যের পরিবর্তে মানুষের কথা মুখ্য স্থান অধিকার করল উপন্যাসে। মানবজীবনের সামগ্রিক একটি রূপকে ধারণ করার মাধ্যম রূপে উপন্যাস রচনার উদ্যোগ সফলতা লাভ করল।

উপন্যাসের যাত্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখরা ঐতিহাসিক, রোমাঞ্চধর্মী, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে উপন্যাসের আধার রূপে ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর জাদুকরী কথাবয়নে পল্লীসমাজের অবহেলিত, সাধারণ নর-নারীর সম্পর্ক, সাধারণ জীবনকেন্দ্রিক প্রাণবিহ্বলতাকে লেখায় ফুটিয়ে তুললেন। কখনও সমাজ-বিগর্হিত প্রেম, কখনও সারল্যে ভরা মমত্বের আখ্যান বুনলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যধর্মী ও রোমান্টিক ভাবরসের উন্মোচন করলেন আবার আঁতের কথা বের করে আনতে চাইলেন উপন্যাসে। 'চোখের বালি'তে মনস্তাত্ত্বিক রূপটি উদ্ভাসিত হল, তো 'চার অধ্যায়'-এ রাজনৈতিক আবহ, 'চতুরঙ্গ'-এ আত্মবিবৃতিমূলক ডায়েরিধর্মী রচনায় মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত হল। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির টানে, মানবজীবন ও প্রকৃতির সারল্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্রতী হলেন। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'ইছামতী' ইত্যাদিতেই পড়ে রইল তার চেতনা মন। তারাশঙ্কর ঐতিহ্যের ভাঙন ও জমিদারি বিলুপ্তি, জমিদার ও জনগণের দ্বন্দ্বময় রূপকে তুলে ধরতে আগ্রহী হলেন 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ইত্যাদির ধারাবাহিকতায়। মানবজীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির উন্মোচন এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রত্যাখ্যানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও সমাজের প্রান্তিক নিম্ন শ্রেণিকে তুলে ধরলেন 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে আবার কখনো মনোবিশ্লেষণাত্মক গভীর মানসিক দ্বন্দ্ব, সামূহিক নির্জ্ঞানের প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য়। জগদীশ গুপ্ত সমাজের নিম্নশ্রেণির কদর্য বাস্তবকে রূপ দিতে

'লঘুগুরু' রচনা করলেন। এভাবে সময় ও সময়ের প্রতিঘাত, বাস্তব জীবননির্ভর উপাদানে উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্রময় হয়ে প্রসারিত হতে লাগল। বিষয়বস্তুর উত্থাপনে, ভাষার ব্যবহারে, পাঠকৃতির অন্তর্বস্তু নতুন নতুন দিক উন্মোচন করল পাঠক মহলে। তাই তার প্রকরণ ও রচনাশৈলীও ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে পুনরাবিষ্কার করে চলেছে।

উপন্যাসের বিষয়বিন্যাস সম্পর্কে বিশ্বায়নের এই যুগে তার নির্দিষ্ট অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রবহমান সময়ের পরিবর্তনে, নতুন নতুন আবিষ্কারের যান্ত্রিক যুগে তাঁকে নির্দিষ্ট ছকে নিয়মে বাঁধা যায় না।

আধুনিক মনন ও চেতনাবোধ থেকে উপন্যাসের উন্মেষপর্ব সূচিত হয়েছিল। বহমান সময় ও সামাজিক প্রেক্ষিতে আজ সচেতন লেখকরা নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁরা সময়োপযোগী বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব রচনাপদ্ধতির গুণে রচনাকে স্বতন্ত্র রূপে দাঁড় করিয়েছেন। অন্তর্জাল (internet) ও অত্যাধুনিক গণমাধ্যমের যোগাযোগে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির সহজ সুযোগ করে দেওয়ায় সমৃদ্ধ হয়েছে চিন্তা-চেতনার পরিসরও।

পণ্য-বিনোদনের বাজার ধরে রাখতে মনোরঞ্জনের জন্য অনেক লঘুরচনাও প্রসার লাভ করেছে। অনেক রম্যরচনাও তৈরি করা হচ্ছে। এই নিবন্ধে তার আলোচনা অবান্তর। নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন লেখকরা এখনও নিজস্ব মেজাজে বহুস্বরিক সম্ভাবনাময় সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। তাঁদের রচনায় সমাজ-বীক্ষা ও আত্মসমীক্ষণের প্রয়াস রয়েছে। আরও রয়েছে ইতিহাস, দেশ-কাল সংস্কৃতির তাৎপর্য সন্ধান। আজকের দ্রুত গতিময় ব্যস্ত জীবনে রাজনৈতিক লোভ, স্বার্থপরতা, দাম্পত্য ভাঙন, বেকারত্ব আর্থিক শোচনীয়তা, ভোগবাদী মানসিকতার জ্বলন্ত সমস্যার বিশ্লেষণও পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও দেখা যায় হারানো জীবনের শিকড়ের টানে হারানো দেশে অতীতচারিতায় নিজেকে সন্ধান। হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি, অমর মিত্রের 'ধনপতির চর', সুনন্দা শিকদারের আখ্যান 'দয়াময়ীর কথা', রণবীর পুরকায়স্থের 'সুরমা গাঙর পানি', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ধূসর সময়', রমাপদ চৌধুরীর 'মানুষের সংসার', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সাত পুরুষ ডট কম' ইত্যাদি। এই উপন্যাসগুলো বিষয়বিন্যাসে স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ একুশ শতকেও কিছু সাবলীল রচনায় রয়েছে দায়বদ্ধতা,

আত্মনিরীক্ষণ ও সমাজ-বীক্ষামূলক ব্যতিক্রমী সম্ভাবনার অঙ্কুর। সুনন্দা শিকদারের 'দয়াময়ীর কথা', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' ও শেখর দাসের 'বিন্দু বিন্দু জল'-এর মতো প্রতিবেদনে তার অভিজ্ঞান পাওয়া যায়।

নারীচেতনাবাদী কিছু লেখিকাদের কলম সরব হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে। এগুলোতে শুধু উগ্র নারীবাদই মুখ্য নয়। রক্ষণশীলতার বিপ্রতীপে উঠে এসেছে সমাজ, পরিবার, যৌনতা, মানবিক সম্পর্কের সংস্কারমুক্ত বিচার-বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হতে পারে বাণী বসুর 'শ্বেতপাথরের থালা', 'তিমির বিদার', শাকম্বরীর দ্বীপ, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন', 'শূন্য থেকে শূন্যে' ইত্যাদি। আধুনিক সময়ের লেখিকারা ইতিহাস, পুরাণ ও বাস্তবের আধুনিক জীবনবোধের সমন্বয়ে যোগসূত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। যেমন — সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগিনী', 'শঙ্খিনী', তিলোত্তমা মজুমদারের 'বসুধারা' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। বিশ শতকের শেষার্ধে নারীচেতনাবাদী সাহিত্যে নারীর সমস্যাগুলোর প্রাধান্য ছিল বেশি। কিন্তু একুশ শতকে ব্যক্তি-নারী ও অস্তিত্বের দাবিই প্রাধান্য পাচ্ছে।

বিশিষ্ট কিছু প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বর্তমান সময়ের অভিঘাতের চিহ্ন। সমকালীন দেশ-কালে তুষের আগুনে জ্বলতে থাকা দাবদাহর বার্তা। মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, সমাজবীক্ষণ ও আত্মনিরীক্ষণ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ধূসর সময়', 'চক্র', দেবেশ রায়ের 'যুদ্ধের ভিতরে যুদ্ধ', মহাশ্বেতা দেবীর 'স্বপ্ন দেখার অধিকার' ইত্যাদি। সময়ের নির্দিষ্টতার জন্য শতকের বিভাজন হলেও এই বিভাজনে সাহিত্যকে আজ যেন বাঁধার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে যারা লিখছেন তাঁদের অনেকের লেখা সাম্প্রতিককালেও অব্যাহত রয়েছে। সময়ের সঙ্গে শুধু সমস্যা তাদের লেখায় নতুন নতুন রূপ নিয়ে উঠে আসছে।

উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা

আধুনিক মনন ও চেতনাবোধ থেকে ইউরোপীয় মডেল অনুসরণ করেই মূলত উপন্যাসের যাত্রারম্ভ। বহমান সময়ের সঙ্গে, সামাজিক প্রেক্ষিতে সে কিছুটা নিজস্বতাও অর্জন করেছে। এই সময় আমরা নতুনত্বকে গ্রহণ করার তাগিদে অনেকটা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সাহিত্য আর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় না শুধু। রচিত হয় দেশের ইতিহাসকে ধারণ করার জন্য। সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যে অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র রূপে।

বিশ শতকে বিভিন্ন তত্ত্বকথার প্রচার সমালোচনা সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করেছে। এই তত্ত্বের ফলে উপন্যাস নামক সাহিত্য থেকেও ওঠে আসে অনেকার্থদ্যোতনা। জীবন ও জগৎ বৈচিত্রময়তায় ভরা। জীবন ও জগতেরই প্রতিচ্ছবির শিল্পিত রূপ উপন্যাস। উপন্যাস পাঠের প্রচলিত সংজ্ঞাকে পাল্টে দিয়েছে বিভিন্ন তত্ত্বের সন্নিবেশ। নিছক কাহিনি পড়ার মধ্য দিয়ে লঘু মুহূর্তের বিনোদন আর উপন্যাস নয়। উপন্যাস যে সময় - সমাজ - সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিন্যাস তথা ব্যক্তি সত্তা এবং সামাজিক অস্তিত্বের অন্বয়-অনন্বয়ে গড়ে ওঠা এক বিচিত্র শিল্প মাধ্যম। তত্ত্বাশ্রিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠকের কাছে আজ এই সত্য উন্মোচিত। তাই নানা তাত্ত্বিকের পারিভাষিক প্রয়োগে উপন্যাসের তন্নিষ্ঠ পাঠ শুধু উপন্যাসের বিশেষত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেনি, পাঠকের মর্যাদাকেও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ শতকের তত্ত্বনির্ভর আলোচনার ফলে পাঠকৃতি (Text) এখন আর যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে থাকে না। পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের (Reader response theory) দৌলতে পাঠক পাঠকৃতি থেকে নিংড়ে নেয় তার নির্যাস। একটি পাঠকৃতির বিভিন্ন আংশিক তাৎপর্যকে সংযোগ করে সামূহিক মানব জীবনকে ও সমাজকে বুঝতে পারি। একক স্বর সামাজিক অন্তঃস্বরে অন্বিত হয়ে বহুস্বরে পরিণত হয়। উপন্যাসের প্রতিটি স্বর ও অস্তিত্ব মানবচৈতন্যেরই প্রকাশ। উপন্যাসের বহুমাত্রিক দ্যোতনা সময় এবং পরিসর, সত্তা এবং অপরতার নির্মিতিতে বহুস্বরে (polyphony) রূপান্তরিত হয়। একক সত্তা এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। বাখতিন তাই বলেন - 'self can never be a self sufficient construct' সত্তা অপরতার উপস্থিতিতে সম্পূর্ণতা অর্জন করে। ফলে আধুনিককালের শিল্প-মাধ্যম উপন্যাস তার একমুখীনতা বর্জন করে অনেকার্থদ্যোতনা অর্থাৎ (Social Heteroglossia) সামাজিক বহুস্বরিকতার তাৎপর্য বহন করে।

ছোটগল্পে একমুখীনতা কাম্য হলেও বহুস্বরের সন্ধানই উপন্যাসকে সার্থক করে। একটি উপন্যাস একটি বিশেষ ঘটনা বা সামাজিক অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে এগোলেও তার মধ্যে আমরা বিভিন্ন স্বরকে খুঁজে পাই। লেখক স্বর বা কোনো কথক-স্বর, উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমগ্রতা পায়। এই স্বরগুলো একক কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে অন্বিত। একে অপরের পরিপূরক। আলো ছাড়া যেমন অন্ধকারকে বোঝা যায় না। কেন্দ্রের চতুর্দিকে যেমন প্রান্ত থাকেই। ঠিক ঔপন্যাসিক পরিমণ্ডলে বহুস্বরিক ভাবনার বৃত্তাকার সংযোগকেই গড়ে তোলা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু' উপন্যাসে আমরা সার্থকভাবে বহুস্বরের গুঞ্জন শুনতে পাই। লেখক-স্বর আধিপত্যবাদী মজিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। যদি এককভাবে দেখা যায় জমিলার প্রতিটি নীরব আচরণে নারীচেতনাবাদী স্বর প্রতিবাদের পথে চলেছে। কিংবা উপন্যাসের নিঃস্বর নারী রহীমার সেই 'ধান দিয়া কি হইব যদি মানুষ না থাকে' এ উচ্চারণে মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং সে সঙ্গে নারীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে বেরুনো স্ফুলিঙ্গই প্রকাশ পেয়েছে। ওয়াসিমের বিদ্রোহে প্রকাশ পেয়েছে আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কণ্ঠস্বর। এভাবে আমরা বিভিন্ন স্বরের সম্মিলিত স্বরকে পাই এই উপন্যাসে। বহুস্বরের সম্মিলিত রূপ এবং অনেকার্থদ্যোতনার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উপন্যাসটি অনন্যতা লাভ করেছে। এই বহুস্বর বা polyphony এবং অনেকার্থদ্যোতনা বা heteroglossia নামক বিশেষ উপন্যাস-সংক্রান্ত পরিভাষা দুটি আমরা বাখতিনের কাছ থেকেই পেয়েছি। এবং তার ফলে উপন্যাস পাঠের সব রুদ্ধ অর্গল সরে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন পথ।

কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় সামূহিক নির্জ্ঞানের ছবি (collective unconsciousness) লক্ষিত হয়। একদিকে সামাজিক কুসংস্কার অন্যদিকে শশীর যুক্তিনির্ভর আধুনিক মননের দ্বন্দ্ব। কুসুমের স্বরে তার কাঙ্ক্ষিত নারীমন অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রাখেনি। সে সমাজ বিধানের সতীত্বের সংজ্ঞার চেয়ে 'নারীত্ব'কে বুঝতে চেয়েছে। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারে 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর কেমন করে ছোটবাবু'। তার রক্তমাংসে মিশ্রিত প্রেমকে সে প্রকাশ করেছে। সে সমাজের, ধর্মের নির্মিত শৃঙ্খলকে রীতি-নীতিকে মান্যতা দেয়নি। কুসুম নিজের আকাঙ্ক্ষা চাহিদা পূর্ণ করে বাঁচতে চাওয়াকে গুরুত্ব দিয়েছে। অক্ষম স্বামীর কাছে কুসুমের যৌবন অনর্থক। তাই শশীকে সে প্রেম নিবেদন করে বসে। কিন্তু সামাজিক সংস্কার ও নিয়মের ধোঁয়াশায় আবদ্ধ শশীর মন তাতে সাড়া দেয় না। শশীর অবহেলায় প্রত্যাখ্যানে কুসুম আহত হয়েছে। কুসুমের চেতনা ও বোধ তার ব্যক্তি-সত্তাকে নাড়া দিয়েছে। শশীর প্রত্যাখ্যানের পর সে তার ব্যক্তি-মর্যাদাকে বড় করে দেখেছে। পরে শশী তাকে গ্রহণ করতে চাইলেও কুসুম তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। তাই সে শশীকে বলতে পারে 'তপ্ত লোহাকেও মাটিতে ফেলে রাখলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যায় ছোটবাবু।' এভাবেই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে আমরা সামূহিক স্বরের ভেতর থেকেই শুনতে পাই ব্যক্তির একক স্বর যা একটি স্বরের চর্তুদিকে 'chorus' এর মতো বাজতে থাকে। তখন উপন্যাসে বাখতিন কথিত 'Social Heteroglossia' পূর্ণতা পায়। উপন্যাস শুরু থেকে

একটি একটি মাত্রা অতিক্রম করে তার সামগ্রিক রূপ ধারণ করতে করতে বহুমাত্রায় রূপান্তরিত হয়।

সমালোচক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য লক্ষ করা যায় —

> ‘‘বলা বাহুল্য এই দ্যোতনাও গড়ে উঠেছে অতীত ও বর্তমান; অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে পাওয়া মূল্যবোধ ও যথাপ্রাপ্ত বিশ্বাসের দ্বিবাচনিকতায়। বিচ্ছিন্ন একটি মুহূর্ত ও বিচ্ছিন্ন নয়, স্মৃতিকে ঘিরে থাকে অজস্র বিস্মৃতি। ----- নানা স্বরন্যাসের বিভঙ্গে অনেকার্থদ্যোতনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়। অনেকান্তিক তাৎপর্যবাহী উপন্যাসকে তিনি গ্রহণ করেন দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ পড়ুয়ার সঙ্গে লেখক উপস্থাপিত চরিত্রও আখ্যানের দ্বিবাচনিকতায় উপন্যাসের শিল্পরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে।’’[৬]

সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে উপন্যাসই এমন শিল্প যেখানে সামগ্রিক জীবনের চলচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়। বৈচিত্রময় জগতের সমস্যা ও স্থানভেদে সমাজের ভাঙাগড়ার এই আধুনিকোত্তর যুগে যদিও সমগ্রতাকে তুলে ধরা হয় তবুও বিশেষত আলোকপাত করা হয় প্রধান সমস্যার উপর। এই বিষয়কে মাথায় রেখেই উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ জরুরি হয়ে পড়ে।

সাহিত্যের ধারায় দেখা যায় সমালোচকগণ উপন্যাসকে বর্গগত দিক থেকে দুভাগে ভাগ করেছেন। নভেল এবং রোমান্স। কাব্যিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসকে নির্দিষ্ট করেছেন রোমান্সধর্মী উপন্যাসের শ্রেণিতে। নভেলকে প্রকৃতিভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক রূপে ভাগ করেছেন। প্রকৃতিগত ধারার মধ্যে কাহিনি প্রধান এবং চরিত্র প্রধান উপন্যাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়গতভাগে সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, আঞ্চলিক ও অন্যান্য উপন্যাসকে ধরা হয়েছে। এছাড়াও সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থে বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে উপন্যাসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। কাব্যধর্মী উপন্যাসে থাকে উপন্যাসের স্নিগ্ধ মধুর জীবনদর্শন, কবিদৃষ্টি সম্পন্ন উদার ভাবুক চরিত্রের সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’ কাব্যধর্মী উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সামাজিক উপন্যাসের অবতারণায় থাকে পারিবারিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কোনো সমস্যা। শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, রমেশচন্দ্রের ‘সমাজ’, ‘সংসার’ প্রভৃতি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রিক অচলাবস্থা, আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ জনিত সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসের অভিধা দেওয়া যায়। সতীনাথ

ভাদুড়ীর 'জাগরী', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদিতে তা লক্ষণীয়। যেসব উপন্যাসে চারিত্রিক বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব বিচার গভীরভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এর মধ্যে অন্যতম। যেখানে লেখক আঁতের কথা বের করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক অতীতের, ইতিহাসের কোনো তথ্য সম্বলিত কাহিনিকে অবলম্বন করেন। তার মধ্যে গৌণরূপে অবশ্য কাল্পনিক কিছু চরিত্র ও ঘটনাও সাহিত্যের নান্দনিক সৌন্দর্যের খাতিরে অবস্থান করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্রের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে। আঞ্চলিক উপন্যাসে লেখক নির্দিষ্ট স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেন। সেই অঞ্চলের ভাষা, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক অনুষ্ঠান বা জেলার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার সন্নিহিত থাকে। তারাশঙ্করের গল্পে, উপন্যাসে তাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত বীরভূম জেলার বর্ণনা তাঁর উপন্যাসে বেশি পাওয়া যায়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আঞ্চলিক স্থানীয় বিষয়বস্তু-নির্ভর উপন্যাস।

চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে থাকে মানুষের অন্তর্চেতনার গভীর ভাবনার কথা। একটি বিশিষ্ট চরিত্র তার বাস্তব থেকে স্মৃতি-রোমন্থনে অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র স্থাপন করতে থাকে। অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীতে তার মানসযাত্রা চলে। বাংলা উপন্যাসে এর প্রথম স্ফুরণ ঘটে রচনার দিক দিয়ে গোপাল হালদারের 'একদা'-য়, প্রকাশকালের দিক দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা'-য়। উপন্যাসের বিভক্তিকরণে আরেকটি বিভাগ হল আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আত্মজৈবনিক বা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লেখকের সৃষ্ট চরিত্র নিজের কথা বলে যায়। উপন্যাসের সামগ্রিক রূপ সংস্থাপনে তার উক্তি, বর্ণনায় পারিপার্শ্বিক বর্ণিত হয়। এখানে আত্মজীবনীর মতো শুধু প্রধান চরিত্রই মুখ্য নয়। তার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রও অনেকটা মুখ্য স্থান লাভ করে। লেখকের আত্মজীবনের উপাদানে কল্পনা ও বাস্তবের গ্রহণ-বর্জন-পরিমার্জন-সংযোজনে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায় পরিশীলিত হয়ে গড়ে ওঠে অনন্য এক প্রতিবেদন।

আত্মজৈবনিক উপাদান, কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়ে গঠিত উপন্যাসের একটি বিশেষ ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে আত্মজৈবনিক উপাদান এবং ঔপন্যাসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর নতুন রূপ উন্মোচিত হয়। প্রাথমিকভাবে উপন্যাসের উপাদান কী, তার উত্তরে বলা যায় জীবন। এই জীবনেই তো জড়িত সমকাল, সমাজ, পরিবেশ, প্রতিবেশ, ইত্যাদি। হেনরি জেমস বলেছিলেন Art of

Fiction গ্রন্থে

> "A Novel is a living thing all one and continuous like any other organism and in proportion as it lives will it, be found I think, that in each of the part, there is something of the other parts."[৭]

আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে যেহেতু আত্মজৈবনিক উপাদানসম্পন্ন উপন্যাসের মূল আলোচনার ওপর। লেখকের শ্রেষ্ঠ, মাঝারি প্রায় সব ধরনের লেখা তাঁর চেতনার, অভিজ্ঞতার উপাদানেই সমৃদ্ধ। সাহিত্য রচনায় তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন অভিজ্ঞতার উপাদান ও ছাপ থাকবেই। কিন্তু তার বিশেষ কিছু রচনায়, বিশেষত দেখা যায় ব্যক্তি-জীবনের ছাপ, তাঁর নিজের সঙ্গে ঘটা ঘটনার উপাদান পরিলক্ষিত হয়। সেই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আমরা কিছু উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের আভিধায় অভিহিত করতে পারি।

আত্মজীবনী এবং উপন্যাস সাহিত্যের দুটি ধারা। আত্মজীবনী উপন্যাস নয় এবং উপন্যাসও আত্মজীবনী নয়। ঔপন্যাসিকের রচনা বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ যেখানে পরিলক্ষিত হয় আত্মজীবনের উপাদান। একান্ত নিজস্ব কিছু ঘটনা এবং কখনও দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন। ঔপন্যাসিক এই ধরনের রচনায় আত্মজীবনীর মতো সরাসরি তার রচনায় উপস্থিত থাকেন না। কিছু একান্ত ভাবাদর্শ (ideology) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (personal experience) এবং বিশেষ মুহূর্তের ঘটনাকে পর্যায় ক্রমিক বিচার-বিশ্লেষণে ব্যক্ত করেন।

আত্মজীবনী (Autobiography), জীবনী (Biography) এবং সাধুসন্ত বা মহাপুরুষদের জীবনী (Hagiography) সাহিত্যেরই অঙ্গ। এই সমস্ত রচনায় প্রধান ব্যক্তির জীবনই মুখ্য স্থান লাভ করে এবং সমসাময়িক সমাজ জীবন গৌণরূপে চলে এর সঙ্গে সঙ্গে। আত্মজীবনী এবং আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের ভিন্নতা সম্পর্কে বোঝাতে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

১) আত্মজীবনী লেখকেরই জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যান। আর উপন্যাস তার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত জীবন উপাদান বিশিষ্ট বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের জীবনদর্শনের আখ্যান।

২) আত্মজীবনী লেখকের বাল্যজীবন থেকে শুরু করে পরিণত জীবনের একটি পারম্পর্য বহন

করে। কিন্তু উপন্যাস তার জীবনে ঘটা, বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ঘটনাবলীকে পুঞ্জীভূত করে তার কাঠামো তৈরি করে।

৩) লেখকের হয়ে ওঠার কাহিনি, তাঁর জীবনের ঘাত-সংঘাত, অনুভূতি মুখ্যত স্থান লাভ করে আত্মজীবনীতে। কিন্তু উপন্যাসে লেখকের জীবন কাহিনি মুখ্য নয়, সামাজিক অবস্থানে তাঁর পরিচিত জীবনে অন্যান্য ব্যক্তিসত্তাও তাকে সম্পূর্ণতা দেয়। এখানে আত্মজীবনীর একরৈখিক পথ অতিক্রম করে, জীবনের তাৎপর্যকে তুলে ধরতে অপর সত্তাগুলোর সমাবেশে বহুরৈখিক পথ অবলম্বন করা হয়।

৪) আত্মজীবনীতে লেখকের জীবনের বাস্তবকে আত্মিক অনুভূতি ও সমসাময়িক ঘটনাকে সরাসরি তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়। কী ঘটেছিল সেটাই মুখ্য, অবশ্যই তার মধ্যেও তাঁর জীবনদর্শনের কিছুটা সামাজিক আলেখ্য থাকে। আর উপন্যাসে জীবনের উপাদানগুলোকে পারম্পর্যপূর্ণভাবে বিন্যস্ত করে বাস্তব ও কল্পনার যোগে সার্বিক ভাবাদর্শ সম্পন্ন সমাজ-বীক্ষার পরিচয়বাহী একটি কথকতা প্রস্তুত করা হয়।

৫) আত্মজীবনীতে লেখকের স্বীকারোক্তি বা confession-ই প্রধান। কিন্তু উপন্যাসে তাঁর অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শন, ভাবাদর্শই মুখ্য।

বাংলা সাহিত্য জগতের দুই কীর্তিমান যশস্বী মনীষীর দুটি বিরুদ্ধ মন্তব্যকে মনে রেখে আত্মজৈবনিক বা আত্মজৈবনিক উপাদান বিশিষ্ট উপন্যাসের আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে।

কবিকে পাবে না তার জীবনচরিতে, কথাটি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ' এই মন্তব্যটি করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিকে তার জীবনীতে পাওয়া যায় না। আবার কবিত্বের চেয়ে কবিকে বুঝতে পারলে বেশি লাভ। দুই বিরুদ্ধ মন্তব্যের নিরিখে এই সিদ্ধান্তে যাওয়া যেতে পারে যে কবিকে সরাসরি জীবনীতে পাওয়া যায় না। কারণ কবিত্ব তাঁর দার্শনিকতা, ভাবাদর্শের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং জীবনী তাঁর হয়ে ওঠার লিপিবদ্ধ কাহিনি, জীবন অভিজ্ঞতার বয়ান। কিন্তু যদি তার সমগ্রতাকে বুঝতে চাই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁর রচনাকে বুঝতে যাওয়া আংশিকতা দোষে দুষ্ট হতে পারে। তাই মনে হয় আত্মজৈবনিক উপন্যাস রচনার ধারায় তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা, ভাবাদর্শ এবং দার্শনিক মননের যুগ্ম মিশ্রণে

উপন্যাসীকরণ (Novelisation) ঘটে যা আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে তার বিষয়বিন্যাস ঘটে।

লেখকের দ্বৈত সত্তা এই ধরনের রচনায় কাজ করে। একদিকে তা লেখকের সমস্ত জীবনব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নির্যাস। অন্যদিকে উপন্যাস নামক শিল্পসাহিত্যের সমাজ নিদর্শনের স্বরূপ। লেখক এখানে ধরা দিয়েও অধরা থেকে যান। তার আত্ম এবং পর দুই-ই যেন সমান্তরালতা রক্ষা করে চলে। কাহিনি গ্রন্থনায় মধ্যে মধ্যে লেখকের ছায়া পড়ে ; আবার তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেই যেন অদৃশ্য হয়ে পড়ে। জীবনের সত্যান্বেষণে, পথ পরিক্রমায়, জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে বিস্তৃত প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, সমাজ, সময়, পরিবেশ এবং বৃহৎ জীবনদর্শনকে তুলে ধরতেই এই বৃহৎ সাহিত্য শাখাটি সক্রিয় হতে পারে। এভাবেই 'উপন্যাস' নামক সাহিত্য শাখাটি লেখকের কিছু ব্যক্তিগত মুহূর্তকে কেন্দ্র করে আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়। একটি নতুন আদলে, নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটে। এই ধরনের রচনা স্বতন্ত্র আত্মজীবনী বা শুধু উপন্যাস না হয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বিষয়গত ভাগের দিক থেকে আত্মজৈবনিক উপাদানের সমৃদ্ধিতে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র বর্গীকরণে আবদ্ধ হয়ে পরে।

উপন্যাসের এই নতুন বর্গীকরণে দেখা যায় বিষয়গত দিক থেকে সরে এসে তার রচনাশৈলীও একটি নিজস্ব পথে চলতে আরম্ভ করে। এখানে উপন্যাসের গতানুগতিক ধারা ভঙ্গ হওয়ার দরুন বিষয়গত এবং শৈলীগত স্বতন্ত্রতা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বিষয়ের উপর নির্ভর করে শৈলীগত রূপটিও নতুন রূপে প্রস্ফুটিত হয়। 'style is a man' - প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির নিজস্ব চলা, বলার ধরন স্পষ্ট করে তাঁর জীবনকে। নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দেয়। অ্যারিস্ট্যোটল কথিত উপন্যাসের কিছু প্রাকশর্ত থাকে অবশ্যই, উপন্যাস হবে আদি, মধ্য, অন্ত বিশিষ্ট। তার মধ্যে থাকবে কাহিনি, সেইসঙ্গে প্লট হবে সুগঠিত। এছাড়াও থাকতে হবে তাদের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক। কিন্তু আত্মজৈবনিক উপাদান বিশিষ্ট রচনা এই সব শর্ত রক্ষা করেও যেন আলাদা একটি পথে যাত্রা করে। তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে দেখা যেতে পারে।

১) এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায়।

২) ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটে স্মৃতিবদ্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে। জীবনের ঘটে যাওয়া স্মৃত-বিস্মৃত ঘটনাগুলোকে পর্যায় ক্রমিক সাজিয়ে নেন লেখক।

৩) 'Flash Back' বা রোমন্থন পদ্ধতিতে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে কখনো কখনো মানসিক যাত্রা ঘটে চরিত্রের মাধ্যমে লেখকসত্তার।

৪) এই ধরনের উপন্যাস ঔপন্যাসিকের বৃহৎ জীবন অভিজ্ঞতার, জীবন পরিক্রমার ফসল। এই পরিক্রমায় আত্মসচেতন এবং সমাজ-সচেতন মন বিভিন্ন ঘটনা থেকে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে নিতে চেয়েছে। যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটানো সম্ভব একমাত্র উপন্যাসে।

'নতুনত্ব' শব্দটি একটি বৈচিত্র নিয়ে আসে। এই বৈচিত্রের ফলেই আমরা নিজস্ব ধরন, ধারা ইত্যাদির পার্থক্য নিরূপণ করি। বিভিন্ন বিপ্লব, নবজাগরণ, বিদ্রোহ জীবনের চলার ধারাকে, ভাবনাকে পাল্টেছে। এই সমাজবিপ্লবের ফলস্বরূপ সাহিত্য লেখার বলার ধরনও পাল্টেছে। চিন্তাবিদ বুফোঁ 'style' কথার মূল তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছিলেন 'style is a form of man's thought' অর্থাৎ শৈলী হল মানবচৈতন্যের চিন্তাধারারই নিজস্ব একটি প্রকাশ। Stephen ulman তার 'meaning and style' এ বলেছেন — 'It is a matter not of a technique but of highly personal mode of vision' প্রত্যেক রচনাকারের নিজস্ব মননে, মেজাজে নিজস্ব একটি ধরন, পদ্ধতি কাজ করে। নিজস্ব এই পদ্ধতি লেখনীতে স্বতন্ত্র বিশেষত্ব পায় বলেই নতুন আদলে, নতুন ধরনে তা রূপ লাভ করে। শৈলীর রূপ স্পষ্ট করার জন্য চিন্তাবিদ মিডলটন মারে তিনটি কথার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই তিনটি শব্দই অনেকটা শৈলীর রূপ নির্দেশ করে — 'Style; a personal idiosyneracy, style, as technique of expression, style, as the highest achievement of literature.'

সমালোচক লুকাচ বলেছেন শৈলী হল — 'A completely adequate expression in language of a writers mode of feeling'। একজন লেখকের সঙ্গে অন্য আরেকজন লেখকের রচনার পার্থক্যের মূলে রয়েছে কেবল বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি। যে কোনো রচনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার লিখন পদ্ধতি যার নাম শৈলীর (style) ওপর। তা একান্তই লেখককে স্বতন্ত্রতা দেয়। গতানুগতিক পথ থেকেও আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠক আস্বাদ নেই নতুন ব্যতিক্রমী সাহিত্যের। বর্তমান শৈলী শুধু ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়। শৈলীর নতুন নতুন প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যের নানা অঙ্গেও। উপন্যাস-সাহিত্য তার যাত্রারম্ভ থেকে প্রতিনিয়ত ব্যতিক্রমী পথ অবলম্বন করে চলেছে।

অনেক বড় মাপের লেখকরা আত্মজীবনী লিখেছেন। অনেকের জীবনীও লেখা হয়েছে। কিন্তু

পরবর্তী সময়ে দেখা যায় কিছু লেখক আত্মজীবনী এবং জীবনীর ধার না ঘেঁষে এক ধরনের উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়েছেন। নিজের বিশাল বিস্তৃত জীবনের ঘটনাকে বলতে, লিপিবদ্ধ করতে উপন্যাসের সাহায্য নিয়েছেন। এই পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল হয়তো সমাজ সময়ের কিছু বাধা বিপত্তির ফলে। তাই এই নতুন ধরন, তার শৈলীগত নিজস্বতা নিয়ে একটি অনন্য পথে চলেছে।

আত্মজীবনীতে লেখকের জীবনে হয়ে ওঠা বা তার 'আমি' সত্তাটিই সক্রিয় থাকে। তার প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা, স্মৃতিকেই ধারণ করে চলে। জীবনীমূলক বা এই ধরনের যেমন 'Biography' (জীবনী) 'Hagiograpy' (সাধু সন্তদিকের জীবনী বা মহাপুরুষের জীবনী) তেও সেই বিশেষ 'আমি' বা ব্যক্তিকেই ঘিরে লেখা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের উপন্যাসে উত্তম পুরুষ বা কথক-সত্তা বা উপন্যাসের প্রাণপুরুষ ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যান। চলতে চলতে তার সামনে বিভিন্ন চরিত্র সময়ের জটিলতা, সমস্যা, সংঘাত অনেক বিচিত্র এবং অসংলগ্ন উপাদানকে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে গিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি রূপ লাভ করেছে। এভাবে একজন স্রষ্টা তার সৃষ্ট অজস্র চরিত্রের মধ্যেই নিজের জীবনের উপাদানগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভেঙে গড়ে এগিয়ে যান। যার ফলে গড়ে ওঠে বাখতিন কথিত 'Diological interrelationship' অর্থাৎ আন্তঃসম্পর্কীয় দ্বিবাচনিকতা। লেখকের সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনার সমাবেশে, আবর্তে একটি অন্যটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে থাকে। কাল, ঘটনা স্থান বিচিত্র হয়েও মূল সমস্যা একই সেই জীবনসংগ্রাম। উপন্যাসের বহুমাত্রিকতার বিশ্লেষণের সঙ্গে যখন এর শৈলীগত বৈচিত্রের কথাও আলোচিত হয় তখন মেদবহুল উপন্যাস থেকে নির্মেদ আখ্যানের সতথ্য বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়ে। আখ্যান বা Narrative কে বোধহয় এখন আর এক কথায় বোঝানো যাবে না। তবুও একে বীজ হিসেবে ধরে নিয়ে এগোলে সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে,—

"সম্প্রতি কাহিনির খোলস থেকে মুক্ত হয়ে গেছে আখ্যানের নির্যাস।"[৮]

এই মন্তব্যের নিরিখে বলা যায় আগে আখ্যানে কাহিনির মায়া ছিল উপন্যাসের অলংকারবহুল ফর্মে কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাতেও রূপান্তর ঘটেছে। এতে বিবৃত কথামালা যা সম্বোধক এবং সম্বোধিতের মধ্যেকার সংযোগসূত্র হয়ে ওঠে তাতেও শ্রেণিবৈচিত্র লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

'Narrative' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Genette বলেছেন Narrator (বক্তা/কথক) এবং Narratee (কথোদ্দিষ্ট) এর আন্তঃসম্পর্কের কথা। Genette এর বক্তব্য থেকে দেখা যায় একটি (Narrative)

আখ্যানে তিনি ‘Narrator’ এর তিন রকম উপস্থিতির বা অবস্থানের কথা বলেছেন।

প্রথমত : Heterodiegetic (আখ্যানে ন্যারেটরের অনুপস্থিত উপস্থিতি)। যেমন ‘জাগরী’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : Homodiegetic (উত্তম পুরুষে ন্যারেটরের উপস্থিতি)। যেমন ‘আরণ্যক’।

তৃতীয়ত : Autodiegetic এখানে বিবরণদাতা কাহিনিতে শুধু নয়, মুখ্য চরিত্র হিসেবেও তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন ‘শ্রীকান্ত’, ‘ত্রিদিবা’, ‘অন্তঃশীলা’, ‘আবর্ত’, ‘মোহানা’ ইত্যাদির মধ্যে।

আলোচ্য বিষয়ে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে Genette কথিত ‘Autodiegitic’ স্তরটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এখানে বিবরণদাতা একটি চরিত্রকে স্থির করে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন দিককে সম্প্রসারণ করেন। লেখককে তাঁর কথনে বিভিন্ন চরিত্র ও তাঁর সমাজ অবস্থার বিবরণ দিতে সেই আবহকে তৈরি করতে হয়। বিষয়বস্তুর অনন্যতার জন্য তার প্রকাশভঙ্গিও নতুন রূপ লাভ করে।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস রচনার গঠনগত দিকটির জন্যই উপন্যাসের শৈলীও আলাদা বৈচিত্র লাভ করেছে। এখানে লেখক ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের দ্বৈত সত্তার উপস্থিতি কাহিনি গ্রন্থনার গুণে চলে। লেখকের প্রতিকল্প সত্তা কেন্দ্রীয় চরিত্রে এখানে সূত্রধারের ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন অতীত স্মৃতি মূর্ত রূপে উন্মোচিত হয়ে পড়ে তার মানসপটে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নিজের জাগ্রত ও সুপ্ত অবচেতন মনের মধ্যে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ায় নিমজ্জিত হয়। তখন সে বাস করে অতীতের কোনো মুহূর্তে যে ঘটনা তাকে কখনো হয়তো বিশেষ নাড়া দিয়েছিল। এভাবে সে নিজের অবচেতন মনের সঙ্গে বাচনিক ক্রিয়া করতে করতে পৌঁছে যায় অপর সত্তাগুলোর কাছে। সে মুহূর্তে তার একক সত্তা বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ঘটনার খোঁচা এড়াতে এড়াতে যাত্রা করে বর্তমান থেকে অতীতে। কখনো স্তরে স্তরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনার খোঁচা এড়াতে এড়াতে যাওয়া আবার বর্তমানে ফিরে আসার মধ্যেই যে একটি ঐক্যসূত্র স্থাপনের সার্থকতা প্রকাশ পায় তার মধ্যেই শৈলীগত স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। এখানে প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে —

> ‘‘লেখকের যথাপ্রাপ্ত সময় ও পরিসর থেকে আখ্যানের সময় ও পরিসর যে আলাদা হয়ে যেতে পারে; অন্তত স্বাতন্ত্রের অবভাস তৈরি করতে পারে,

তার কারণ শৈলীগত সার্থকতা। লিখনশৈলী রচনা প্রণালীর ধারাবাহিকতা এবং সাদৃশ্য নির্মাণ সম্পর্কিত যাবতীয় সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে। তাই বিনির্মাণ হল শৈলীর মৌল স্বভাব ও আয়ুধ; শৈলীর জন্ম বিকাশের প্রক্রিয়ায় আমরা নতুন এক জগতের জন্ম ও বিকাশের প্রকরণকে অনুভব করি।"[৯]

এই নতুন রচনাশৈলীর আস্বাদ পাই আমরা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' রচনার পদ্ধতিতে। আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ এই উপন্যাস নতুন আদলে গড়ে উঠেছে। এখানে কথক শ্রীকান্তের চতুর্দিকে আবেষ্টন করে আছে অনেক চরিত্র। শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা স্মৃতির মন্থনে চিত্রিত হয়েছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের শুরুতেই লেখক বলেন–

''আমার 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।"[১০]

এই মনে পড়া কথা শুধু সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি। গতানুগতিক উপন্যাস রচনার পদ্ধতি থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছে। শ্রীকান্ত এখানে নিজের কথা শুধু বলতে বসেনি। তার জীবন অভিজ্ঞতায় পরিচিত এবং সেই পরিচিতদের জীবন সংশ্লিষ্ট কাহিনিকেও আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। এই উপস্থাপন করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে বড় কথা নয়। কিন্তু তার কৃত্রিমতা আমাদের আড়ষ্ট করেনি বরং তাঁর বলার, লেখার ধরন বা প্রকাশভঙ্গি স্বাভাবিক করে তুলেছে প্রত্যেক চরিত্রকে। সেই চরিত্রের অনুভূতি, সুখ-দুঃখ যেন একান্ত সজীব এবং মূর্তভাবেই আমাদের সামনে ভাসমান। শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্রনাথ। উপন্যাসে ইন্দ্র এবং শ্রীকান্তের মধ্যের সম্পর্কই শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি। শ্রীকান্তের অর্ন্তদৃষ্টিতে, উপলব্ধিতে, ইন্দ্রের অভিজ্ঞতা জীবন-যাপন, সুখ-দুঃখ সক্রিয় রূপ লাভ করেছে। যা তাঁর রচনা প্রণালীরই সার্থকতা। শ্রীকান্তের সঙ্গে যত মানব মানবীর পরিচয় ঘটেছে সময়ের প্রবাহে তারা শুধু কাহিনি হয়ে থাকেনি। শ্রীকান্তের অনুভূতির জারিত রসের সঙ্গে আমরা পাঠকও তাদের সঙ্গে পরিচিত ও একাত্ম হয়ে পড়ি। সেই চরিত্রগুলো লেখকের রচনার প্রকাশভঙ্গিতে সক্রিয়তা পেয়েছে। লাভ করেছে অনন্যতা। পিয়ারী বাঈজী উর্ফে রাজলক্ষ্মীর অতীত জীবনকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, রাজলক্ষ্মীর অতীত জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্ত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কিন্তু তার পিয়ারী বাঈজীতে রূপান্তরের করুণ ইতিহাস যেভাবে বর্ণিত হয়েছে; সেখানে শ্রীকান্তের সঙ্গে আমরাও যেন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠি। গৌরী তেওয়ারীর মেয়ের সঙ্গে রেঙ্গুনে

শ্রীকান্তের ক্ষণিকের সাক্ষাতে মূর্ত হয়ে ওঠে তার অতীত কাহিনি। অন্নদাদিদি, শাহজী, নিরুদি, অভয়া, রোহিনি প্রত্যেক চরিত্রের সঙ্গে শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনে কোনো না কোনো সময়ে পথের মধ্যে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এই চরিত্রগুলোর জীবন-কাহিনি, সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা যেন তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যার সঙ্গে লেখক রচনাশৈলীর অনন্যতা ঘটিয়ে পাঠককেও সমব্যথী করতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা সাধারণ পাঠক বিভিন্ন সময় ও পরিসরের নিরিখে সমাজের নানা ঘটনার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হোঁচট খাই না। এই সমস্ত প্রক্রিয়া একমাত্র উপন্যাসের রচনাশৈলীর সুষ্ঠু বিন্যাসের ফলে সম্ভব হয়েছে। এই বৈচিত্র আমাদের বি-স্বাদগ্রস্ত করে না। বরং একটু নতুন আস্বাদ দেয়।

বুদ্ধিজীবী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা- এই ত্রয়ীতেও পাঠকবর্গ অবলোকন করেন অতীত ও বর্তমানের দ্বিরালাপকে।

> ''যখন করোনার সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে রায় দিলেন, 'সাবিত্রী দেবী, খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করেছেন, তখন খগেনবাবু সব কথা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হ'ল না। সাহেব চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন; কিন্তু খগেনবাবু চেয়ারে বসেই রয়েছেন দেখে উকিলবাবু তার জামা ধরে টানলেন, খগেনবাবুর মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, 'ধন্যবাদ'।''[১১]

লেখক খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহননের ঘটনাকে দিয়ে ঘটনার সূত্রপাত করেছেন। স্মৃতির পারম্পর্যে ঘটনার বিস্তার। খগেনবাবু ও সাবিত্রীর দাম্পত্য জীবন, রমলার উপস্থিতি, মাসিমার সান্নিধ্য এবং খগেনবাবুর আত্মমগ্নতার কাহিনি একটি নতুন বুদ্ধিবাদী ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে অন্তঃশীলায়। অন্তঃশীলায় বিশেষভাবে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন চৈতন্যপ্রবাহ রীতির (Stream of concirusness)। এই রীতির প্রাথমিক একটি গতি বহির্জগতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগৎকে দেখানো। এই ধরনের উপন্যাসে বিশেষ কোনো মানব-মনের চেতনা বিশেষরূপে উদ্ভাসিত হয়। যেখানে মানসিক অভিযাত্রার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের চেতনাও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুগুলোও উদ্ভাসিত হতে থাকে চরিত্রের চিন্তাচেতনার মাধ্যমে। এই রীতিতে অতীত ও বর্তমান ঘুরপাক খেতে থাকে চিন্তাচেতনার কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মগ্নচৈতন্যের গভীরে কখনো মুখ্য চরিত্র ডুবে যায়। তখন রোমন্থন প্রক্রিয়ায় অতীতের কোন

কোন ঘটনার উদ্ভাসনে স্পষ্ট হতে থাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু আবার বর্তমানের কোন আবর্তে চরিত্র তাৎক্ষণিকভাবে সচেতন মনে ফিরে আসে তখন তার মধ্যে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তার আচরণে তখন লক্ষিত হয় অসংলগ্নতা। যেমন খগেনবাবুর কিছু আচরণে তা পরিলক্ষিত হয়। এই রীতিরও বাংলা সাহিত্যে প্রথম যাত্রা শুরু 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের মাধ্যমে। উপন্যাসের বিবরণেই দেখি– পাংশুবর্ণ মৃত সাবিত্রীর শব খগেনবাবু লক্ষ করলেন হাতের চুড়িটা ঢলঢলে হয়েছে, গলার হারটা উল্টে গিয়েছে। হারটা দেখেই খগেনবাবুর স্মৃতিতে ভেসে উঠল একদিনের ঘটনা–

> ''এই হার নিয়ে দীর্ঘ অভিমানের পালা হয় তাদের মধ্যে! সাবিত্রী বলেছিল, 'আমি হারটা পড়লে সকলে ব'লে সুন্দর দেখাচ্ছে, তুমি তো মুখ ফুটে একবারও ভাল দেখাচ্ছে ব'ল না।''[১২]

বিভিন্ন অসংলগ্ন টুকরো টুকরো ঘটনা চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মান-অভিমানের পালায় হারের পিনটি নষ্ট হয়ে গেলে স্যাকরাকে নিয়ে আসেন খগেনবাবু। কিন্তু ইতিমধ্যে সাবিত্রী রমলার উদ্যোগে হারটি সারাতে দিয়েছেন শুনতে পান। এখানে সাবিত্রীর কথা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে তার হীনমন্যতা ও সন্দেহপ্রবণতার চারিত্রিক দিকটি প্রকাশিত হয়। যার ফলেই সাবিত্রীর এই করুণ পরিণতি আজ–

> ''উত্তরে সাবিত্রীর মুখ থেকে এক অদ্ভুত জবাব পান, 'পরের বউ-এর গয়না ভেঙে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, নতুন গয়না গড়িয়ে দাওগে, আমার জন্য কোন কষ্ট করতে হবে না'। খগেনবাবুর এক বন্ধু পত্নীর কোন এক গহনা খারাপ হয়ে যায়, পথে স্যাকরা-বাড়ি পড়ে, তাই গহনাটা স্যাকরা বাড়ি পৌঁছে দেন, স্যাকরাটি রমলা দেবীরই আশ্রিত লোক। কথা বেশ হেঁটে বেড়ায়। ঘটনাটি মনে পড়তেই খগেনবাবু উঠে পড়লেন।''[১৩]

অর্থাৎ এই যে রচনা-পদ্ধতি স্মৃতি রোমন্থনে কোন অসংলগ্ন টুকরো ঘটনা দিয়ে সাবিত্রীর চরিত্রকে উদ্ভাসিত করে দেওয়া হল। আবার সম্পূর্ণ বিবরণ না দিয়েই চট করে বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসা। আবারও সাবিত্রীর জ্বলন্ত দেহের দুর্গন্ধে খগেনবাবু চলে যান অতীতে–

> ''মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ! যেন উনুনে ফ্যান পড়েছে। সাবিত্রী

একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তবে তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল, তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন, 'যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না।' সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেন, 'এখান থেকে চলে যাও'। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে।.... প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতে লাগল।"[১৪]

সাবিত্রীর জ্বলন্ত শবকে কেন্দ্র করে সাবিত্রী ও খগেনবাবুর মধ্যেকার সম্পর্ককে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক। বার বার স্মৃতি রোমন্থনে চলে অতীতে মানস যাত্রা, আবার ফিরে আসা। সাবিত্রী এবং খগেনবাবুর দাম্পত্য জীবনের মতানৈক্য এবং সাবিত্রীর জীবনে রমলার সাহচর্য, রমলার গম্ভীর আড়ম্বরপূর্ণ জীবনচর্যার ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে। সাবিত্রী, খগেনবাবু, রমলাকে অনুকরণ করে সাবিত্রীর মেকীপনা এই ত্রিকোণ মানসিক সংঘাতের কাহিনি এগিয়ে চলেছে রচনা পদ্ধতির নতুন কৌশলে একটি নিজস্ব সক্রিয় পথে। খগেনবাবু শুধু ঘটনার বিবরণ দেননি। নিজের যুক্তি এবং বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিক চিন্তাধারায় পাঠককে প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে বাধ্য করেছেন। এখানে মুখ্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখকের রচনাশৈলী তার স্বতন্ত্র প্রকাশ ভঙ্গির বৈচিত্রকে পরিস্ফুট করেছে। আবর্ত ও মোহানায় রমলা, সুজন, বিজন ও খগেনবাবুর বিভিন্ন ঘটনাগুলোও যেন ধাপে ধাপে রচনা শৈলীর নিজস্ব নতুন নতুন পথ অবলম্বন করেছে।

গোপাল হালদার যিনি একটি মহাসময়কে ধারণ করেছেন তাঁর 'ত্রিদিবায়'। সেখানে কাহিনির চেয়ে অস্থির সময়ের মহাকালের বিক্ষিপ্ত, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর সৃষ্ট মুখ্য চরিত্র অমিত এই মহাসময়ের সাক্ষী। তিনি এই মহাসময়ের মহাভারতের একই সঙ্গে দ্রষ্টাও, সাক্ষীও যেন। সুদীর্ঘ কালের অস্থির সময়ের এই বয়ান আমাদের কাছে 'Documentary' হয়ে ওঠেনি। লেখকের অনন্য লেখনী পদ্ধতির অনন্যতায় উপন্যাসের এই নতুন রীতি মনন সর্বস্ব হয়েছে। বৃহৎ বঙ্গদেশের অস্থির সময়ের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের প্রাণবন্ত করে তোলা, লেখকের সূক্ষ্ম চেতনা ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তার জন্য তাঁকে নিজের মত করে গতানুগতিক ধারা অগ্রাহ্য করে নতুন নির্মাণ পদ্ধতি গড়ে তুলতে হয়েছে। কারণ মননের সূক্ষ্মতা ছাড়া সাহিত্যিক আবহ তৈরি করা সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দি অমিত দেখেছে জেলজীবনের এবং বাইরের পৃথিবী। উপলব্ধি করেছে সাধারণ এবং বুর্জোয়া সামন্তবাদীদের জীবনযাত্রা। সমাজের সর্বস্তরে তাঁর বিচরণ ছিল পরিব্রাজকের

মতো। লেখক গোপাল হালদারের মানস চরিত্র অমিতের চেতনার উপলব্ধিতে ক্ষণিকের পরিচিত এক একটি সাধারণ চরিত্রও মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দাবানলে তপ্ত প্রত্যেকটি চরিত্র অমিতের কাছে শুধু রাজনৈতিক, সামাজিক দায়বদ্ধতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। অমিত তাদের অন্তরের জ্বালাকে অনুভব করেছে। তাদের প্রত্যেকের কাহিনি অমিতের স্মৃতিতে রোমন্থিত হয়েছে জীবন্তরূপে। এই যে বিভিন্ন জাতির, জনের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন যন্ত্রণায় পৌঁছানো এবং তাকে জীবন্ত রূপ দেওয়া – লেখকের শৈলী পদ্ধতির অনন্যতাকে প্রকাশ করে।

উপন্যাসের ধারায় বৈচিত্র বিষয়ে আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, বিভিন্ন উপন্যাস রচনার পদ্ধতি থেকে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের শৈলী অনন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রচয়িতার বর্তমান সময় ও পরিসর এবং উপন্যাসের ঘটনায় সময় ও পরিসর এক নয়। তাঁর বর্তমান এবং অতীত দুই-ই প্রচ্ছন্ন ভাবে একটি সমান্তরালতা রক্ষা করে চলেছে খুব সূক্ষ্মভাবে। সমস্ত ঘটনাটি ঘটে যাওয়া। লেখকের সৃষ্ট মুখ্য মানস চরিত্রটিকে সবসময় বর্তমান থেকে অতীতে মানসিক যাত্রা করতে হয়েছে। কিন্তু রচনাশৈলীর বিশিষ্টতার কারণে আমাদের কাছে তা শুধু কাহিনির নামান্তর নয়। একটি বিচ্ছিন্ন সময়, উত্তাল পরিস্থিতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় লিপ্ত প্রত্যেকটি মানুষকে আমাদের আশেপাশের মনে হয়েছে।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস ঔপন্যাসিকের বৃহৎ জীবন অভিজ্ঞতার এবং পরিক্রমার ফসল। এই পরিক্রমায় আত্মসচেতন এবং সমাজ-সচেতন মন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে 'জীবনের তাৎপর্য' খুঁজে নিতে চেয়েছে। মনন ঋদ্ধ সৃষ্টিশীল লেখক জীবনদর্শন ও বাস্তব চিন্তা-চেতনার অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মদর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন লোক, সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনের অনেক ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ঔপন্যাসিক। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা-পুঁজিকেই স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে রচনার আধার রূপে গ্রহণ করেন। আত্মজৈবনিক উপন্যাসে লেখক বিস্তৃত জীবন পরিক্রমায় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধিকে ব্যাখ্যানের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেন। এটাকে শুধু তাঁর স্মৃতিবদ্ধ ঘটনার গ্রন্থনা বলা যায় না। কারণ বিস্তৃত সময়ের ব্যবধানে দেশকাল, সমাজের বিবর্তনের স্বরূপ তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়। নিজের ধ্যান-ধারণায়, আত্মনিরীক্ষণে, নৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে, সমাজ-বীক্ষায় নির্দিষ্ট একটি সমাজতত্ত্বমূলক ভাষ্য প্রকাশ পায় তাঁর প্রতিবেদনে। লেখক এবং তাঁর নির্মিত

প্রতিসত্তা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে 'আত্ম' এবং 'পর' এর সূক্ষ্ম লুকোচুরি খেলা চলে। লেখক তাঁর 'আমি'কে সরাসরি প্রকাশ্যভাবে তুলে ধরেন না কিন্তু তাঁর সৃষ্ট মানস চরিত্রের অন্তরালে নিজের জীবনকে উজাড় করে দেওয়ার তৎপরতা লক্ষ করা যায়। এটাকে জীবন উপাদানে সমৃদ্ধ বিস্তৃত জীবনযাত্রার পর্যবেক্ষণমূলক দলিল বলা যায়। বিভিন্ন সময় জীবনে সম্মুখীন কিছু অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তব ঘটনা তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে হয়তো দোলায়িত করেছে। পরিস্থিতির চক্রপাক, দোলাচলতা পাল্টে দিয়েছে জীবনের স্বরূপকে। যা ঘটেছে 'শ্রীকান্তে' শ্রীকান্তের জীবনে, 'ত্রিদিবা'য় অমিতের এবং 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'য় 'খগেনবাবু'র ক্ষেত্রে। ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়িয়ে শ্রীকান্ত আত্মদর্পণে শুধু নিজেকে নয়, দেখেছে প্রত্যেকটি পরিচিত, ক্ষণিক দৃষ্ট অন্য মানুষের জীবনের যন্ত্রণাকে। যা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছে সমাজের নির্মম সত্যকে। অমিতের এক একটি দিনের অভিজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হয়েছে দূর-বহুদূর প্রসারিত জীবনের বিচিত্র দৃশ্যসম্ভার। খগেনবাবু সাবিত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় বিহ্বল হয়ে আত্মম্ভরী, আত্মমগ্ন জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি পলায়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পলায়ন অসম্ভব জীবন-সমাজ ও মানুষের আত্মিক সান্নিধ্য থেকে। যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্বীকার করেছিলেন গোপনে নিজের আত্মার কাছে। সুজন-বিজন এর সান্নিধ্য, রমলার প্রাণভরা আপ্যায়ন ও আকর্ষণ তাকে ব্যক্তিচেতনা থেকে শ্রেণি চেতনায় উত্তীর্ণ করেছে। নিজের মধ্যে অন্তঃশীল গতিতে ঘুরপাক খেতে খেতে জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন আবর্তের মাধ্যমে মোহনায় পৌঁছেছেন তিনি। মানবদরদী শরৎচন্দ্র, বুদ্ধিবাদী ধূর্জটিপ্রসাদ এবং দেশপ্রেমিক গোপাল হালদারের রচনার চরিত্ররাও নিজের ভাষ্যে তুলে ধরেছে বিভিন্ন মানুষের, সমাজের, কালের সামগ্রিক রূপকে। তাই লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলো অলীক কল্পনা নয়, তারা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে নির্মিত। আত্মজৈবনিক উপাদানমূলক উপন্যাস বিস্তৃত দেশ কাল সমাজ, সময়, লেখকসত্তা, তাঁর সৃষ্ট কেন্দ্রীয় চরিত্র বা লেখকের প্রতিসত্তা ও অন্যান্য অপর সত্তাগুলোর সম্মিলিত উপাদানে সমৃদ্ধ একটি প্রতিবেদন। যা ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক উপাদানের সমৃদ্ধ জীবনভাষ্যের মাত্রা অতিক্রম করে সমাজভাষ্যের দলিলমূলক প্রতিবেদন হয়ে ওঠে। এখানেই আমরা উপন্যাস এবং আত্মজীবনের উপাদানের যৌথ যুগলবন্দিত্বে নতুন ধরনের আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাসের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছি।

তথ্যসূত্র :

১। কমলকুমার সান্যাল (সম্পাদনা), উপন্যাসবীক্ষা, বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, ১৯৮৪, পৃ: ১৩

২। তদেব, পৃ: ২

৩। দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৮২, পৃ: ১৮৯

৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১২, পৃ: ১৪

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ২০১২-২০১৩, পৃ: ৪৪৪

৬। তপোধীর ভট্টাচার্য, বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ২০১০, পৃ: ৭১

৭। কমলকুমার সান্যাল (সম্পাদনা), উপন্যাসবীক্ষা, বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, ১৯৮৪, পৃ: ১১

৮। তপোধীর ভট্টাচার্য, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা-১২, ২০০৭, পৃ: ১৪

৯। বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদনা), শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, কলকাতা-৯, ২০০৩, পৃ: ৬৩

১০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র - ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃ: ২৬৮

১১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১১, পৃ: ৬৭

১২। তদেব, পৃ: ৭৪

১৩। তদেব, পৃ: ৭৪

১৪। তদেব, পৃ: ৭৬